কন্যা শিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ

আজকের কন্যা-শিশুর মাঝেই সুপ্তভাবে বিরাজ করছে আগামী দিনের আদর্শ মা। যেকোনো কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য নারী পুরুষের অবদান অনস্বীকার্য। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে কন্যা শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়।
গৃহ-পরিবেশে একজন পুত্রসন্তানকে যেভাবে গুরুত্ব সহকারে আদর-যত্নে লালনপালন, শিক্ষার প্রতি যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেভাবেই একজন কন্যা-শিশুর মানসিক নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করার কথাই উচ্চারিত হয়ে থাকে এ দিবসে। সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রসহ সমস্ত স্থানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দূরীকরণ হলেও কন্যা-শিশু দিবস অন্যতম উদ্দেশ্য থাকলেও এ বছর থেকে ০৮ অক্টোবর দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় কন্যা শিশু দিবসের এবারে প্রতিপাদ্য হলো আমি কন্যা শিশু স্বপ্নে গড়ি সাহসে লড়ি দেশের কল্যাণে কাজ করি। উল্লেখ যে এবারের কন্যা শিশু দিবস ৩০ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ৮ অক্টোবর পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
বর্তমান নারী অধিকারের যুগে, সুশাসনের ও মানবাধিকারের যুগে কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা আগের তুলনায় অনেক কমলেও তা যে একেবারে নেই, তা বলা যাবে না। এ ধরনের মানসিকতা এখনো আমাদের সমাজ থেকে পুরোপুরি দূর হয়নি। ক্ষেত্র বিশেষে কন্যা সন্তানের প্রতি আগ্রহ বাড়লেও সামাজিকভাবে কন্যা সন্তানের অভিভাবকরা কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে থাকেন। বিশ্বজুড়ে নারী ও কন্যা-শিশুদের প্রতি সহিংসতা ও নৃশংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ শিশু, যাদের বয়স আঠারো বছরের কম। আর শিশুদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ কন্যা-শিশু যাদের পিছনে রেখে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কন্যা-জায়া-জননীর বাইরেও কন্যা-শিশুর বৃহৎ জগত রয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করা ছাড়াও পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন করা সম্ভব। এজন্য কন্যা-শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ বেড়ে ওঠার সব অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানতম অন্তরায় এবং আমাদের সমাজ কন্যা শিশুদেরকে বোঝা মনে করে। কন্যা শিশুদের পড়াশোনার পেছনে টাকা খরচ করতে চায় না। তারা মনে করে বিয়ে দিতে পারলে বোঝা দূর হয়ে গেল। তবে সময় অনেক বদলেছে। কন্যা শিশুরা এখন আর বোঝা নয়। বরং কন্যা শিশুরা হলো সর্বোত্তম বিনিয়োগ ও সমাজের আলোকবর্তিকা। জাতিসংঘের শিশু-বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শীর্ষ স্থানীয়

দেশগুলোর একটি৷ বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়৷ ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ৫২ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়৷ সেভ দ্য চিলড্রেনের তথ্য অনুসারে, ১০ বছর বয়সি কন্যা শিশুদের অনেক বেশি বয়সি পুরুষদের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়৷ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, গরিব নির্বিশেষে আমাদের সমাজে এমনকি নিজের পরিবারেও লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মেয়ে শিশুর প্রতি অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক আচরণ। ফলে অনেকাংশেই দরিদ্রতার প্রথম শিকার হয় কন্যা শিশুরা। কিছু সামাজিক কথিত নীতির কারণে শিশুকাল থেকেই কন্যা শিশুদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে করে তারা প্রতিবাদী হতে না শেখে। তাদের প্রতি করা বৈষম্যমূলক আচরণকে অন্যায় হিসেবে না দেখে বরং সহজাত ও সমঝোতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শেখানো হয়। যা পরবর্তী সময়ে নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতার পথটিকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করে।
শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা কন্যা শিশুর উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং প্ল্যান বাংলাদেশের এক যৌথ জরিপ মতে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করা ২৬ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগে। নিরক্ষর নারীদের বেলায় এই সংখ্যা ৮৬ শতাংশ। সরকার বিগত বছরগুলোতে ছাত্রী ও নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য নারীবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলসমূহে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে।
কন্যা-শিশু সুরক্ষা পেলে সব বৈষম্য দূর হবে। কন্যা-শিশুদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে। বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে নেওয়া হয়েছে কঠোর আইন। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। অভিভাবকদের সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হতে হবে কন্যা- শিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কন্যা-শিশুর অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে পুরুষকে। আর আমাদের দেশে আগে কোনো পরিবারে কন্যা সন্তান হলে খুশি না হওয়ার একটা ব্যাপার ছিল সেটা আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে। আগের মতো এখন আর সেই আক্রোশগুলো নেই যেটা আগে কন্যা সন্তান হলে দেখা যেতো। তবে এখন দেখা যাচ্ছে একটা কন্যা সন্তান হলে বাবা মা যতটা খুশি হয়, তো পরবর্তীতে তারা বড়ো হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক প্রেক্ষাপটে তারা অনেক বেশি কোণঠাসা হয়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, নির্যাতনের শিকার হয় ও অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তো সেইদিক থেকে এখনো কন্যা-শিশুরা পিছিয়ে আছে। আমাদের সমাজে এখনও কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করা হয়। আর আমাদের দেশের শিশুকন্যা সন্তানরা একেবারেই নিরাপদে নেই।
শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে প্রণীত হয় শিশু আইন-১৯৭৪ যা যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে শিশু আইন-২০১১ রূপে প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯-এ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এরপরেও শিশুর প্রতি বৈষম্য আর অধিকারের বিষয়টি আমরা ভুলে যাই। শিশু নীতি অনুসারে শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সি সকল ব্যাক্তিকে বুঝায়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভিষ্ট: ০৫ এ লিঙ্গ সমতা অবস্থান করছে। অর্থাৎ সমতার ব্যাপারটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। মেয়েদের পুষ্টির চাহিদা, শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা, বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসা, বলপূর্বক বাল্যবিবাহ, ধর্ষণসহ যেসব ঘৃণিত কাজকর্ম রয়েছে সেগুলোর নির্মূল করা ছাড়া উপয়ান্তর নেই। কন্যাশিশুদের সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ গণমাধ্যম কাজ করে যাচ্ছে, এসব কাজকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করে তুলতে হবে। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বাজেটের ২ শতাংশ শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখেন যা কন্যা ও পুত্র সকল শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। তবে সমতা বিধানের লক্ষ্যে সরকার কন্যা শিশুদের জন্য নিয়মিত স্কুল, নিরাপত্তা, স্যানিটারি ব্যবস্থা, খেলাধূলার সুযোগ, হেল্পলাইন, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাসহ নানা ধরণের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। তবুও পরিতাপের বিষয় এই যে এখনো কন্যা শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হলে তারা বিষয়টি চেপে রাখে সমাজে লোকলজ্জার ভয়ে। খুবই পীড়াদায়ক হলেও এটাই সত্য আমাদের সমাজে কেউ ধর্ষিত হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধর্ষিতার ছবি ভাইরাল হয়ে যায়, ফলে সেই ধর্ষিত নারীর জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে যায়। যদিও এখন এই বিষয়ে কিছুটা সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো কাজে গভীর রাতে একই বয়সি একটি ছেলে ও মেয়ে যদি রাস্তায় থাকে তখন ছেলেটির ভয় থাকে তার হাতে থাকা মোবাইল ফোন, টাকা-পয়সা ইত্যাদি হারানোর ভয়। বিপরীত দিকে মেয়েটির থাকে সম্ভ্রম হারানোর ভয়। মেয়েদের এই ভয় শিশুকাল থেকে শুরু করে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত থেকে যায়। এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে না বেরুতে পারলে সামগ্রিক উন্নতি অসম্ভব।
অনেক কন্যাশিশু বাবার বাড়িতে ঠিকমতো খাবারও পায় না। পরিবারে খাবারে টান পড়লে সেই টানটা কন্যার উপরই বর্তায়। ঠিক তেমনি বিয়ের পরও প্রয়োজনীয় খাবার পায় না। সুষম খাবার তো অকল্পনীয় বিষয়। ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে অপুষ্টির শিকার হওয়া কন্যাশিশুরা শারীরিক সমস্যায় ভোগে। জন্ম দেয় অপুষ্ট শিশু, রোগাক্রান্ত শিশু।আর নিজের পরিবারে যেমন, স্বামীর পরিবারেও অবদমনের শিকার তারা। ফলে তাদের মানসিক সমস্যাও আশঙ্কাজনক। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি মেয়ে বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের প্রায় অর্ধেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট নাই।অথচ বিদ্যালয়ে মেয়েদের

উপস্থিতির জন্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নির্যাতনের শিকার মেয়েদের মধ্যে দেখা গেছে, ৭২শতাংশ যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। অপরদিকে নির্যাতনের শিকার ছেলেদের মধ্যে ৬৬শতাংশ প্রধানত জোরপূর্বক শ্রমের শিকার হয়। অনেক কন্যা শিশু শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।সারা বিশ্বে মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং নির্যাতন বা সহিংসতামুক্ত জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। প্রতিবন্ধী মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের সহায়তা এবং পরিসেবাগুলো পেতে অতিরিক্ত বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে।আর জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে মেয়েদের অধিকারসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সকলের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক উন্নতি সাধন করেছে।
আজকের কন্যা শিশুই আগামীর পরিপূর্ণ নাগরিক তাই তাদের বেড়ে ওঠা ও বিকাশের প্রতিটি ধাপেই সমান গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য। প্রথমত কন্যা শিশুদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং অন্যদেরও সচেতন করতে হবে। অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতা অর্জন, সুযোগের সঠিক ব্যবহার এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সোচ্চার হয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতে শেখা—এসবই তাদের এগিয়ে যাওয়ার মূল শক্তি। পরিবারের ভূমিকাও এখানে সবচেয়ে বড়। মুাবাবা ও অভিভাবকদের উচিত কন্যা শিশুর প্রয়োজনগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা, বোঝা এবং যে কোনো প্রয়োজনে পাশে থাকা। তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই মেয়েদের মতামত শুনতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে। ঘরে-বাইরে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে কারণ ছেলে ও মেয়ের অধিকার এক ও অভিন্ন। শিক্ষা গ্রহণ থেকে মত প্রকাশ সবক্ষেত্রেই সমান সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব পরিবারকেই নিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ করণীয়। কন্যা শিশুকে সব ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশ ও সম্ভাবনা উন্মোচনে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং সব ক্ষেত্রে মেয়েদের সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি। উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কন্যা শিশুকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার বিকল্প নেই। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত উদ্যোগেই কন্যা শিশুরা হয়ে উঠবে আগামী আত্মবিশ্বাসী নাগরিক।
লেখক: সহকারি তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ‘‘Older Persons Driving Local and Global Action: Our Aspirations, Our Well-being, Our Rights” [illegible] “[illegible]”[illegible]

[illegible]

[illegible]

করেছে। প্রতিবছর ১লা অক্টোবরকে আমরা প্রবীণ দিবস হিসেবে পালন করলেও এবছর সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রবীণ দিবস পালন করা হচ্ছে ৭ই অক্টোবর। আমাদের দেশের চলমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ প্রবীণকে দূর্বল স্বাস্থ্য, বিভিন্ন ধরনের বার্ধক্যজনিত রোগ, আর্থিক দৈন্যতা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতে হয়। দেশে অনেক দক্ষ, অভিজ্ঞ, কর্মঠ ও সৃজনশীল প্রবীণ রয়েছেন; তাঁদের কোথাও কোনো কাজে লাগানো হয়না। বিধায় ঘরে বসে কর্মহীন জীবনযাপনের ফলে তাঁরা বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক রোগে ভুগতে থাকেন। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য তাঁদের সম্মানজনক কাজে নিয়োগ করে সমাজ জীবনের মূল ¯ ◌্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে।
আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ছিল দেশের মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্রতা থেকে মুক্তি, সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তি, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। কিন্ত প্রবীণ জনগোষ্ঠী এ সমাজের জ্যেষ্ঠ নাগরিক হলেও তাঁরা এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত। ১৯৮২ সালে প্রবীণ বিষয়ক সম্মেলন ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বার্ধক্য স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া । কিন্ত বাস্তবতা হলো ২০২৫ সালে এসেও অর্থাৎ দীর্ঘ ৪৩ বছর পেরিয়ে গেলেও এ অবস্থা এখনো বিরাজমান। ২০১৩ সালে দেশে প্রবীণ নীতিমালা ও পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্ত অদ্যাবধি এর বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি দৃষ্টিগোচর হয়না, তৈরী হয়নি বিধি। এ অবস্থার উত্তোরণ ঘটাতে হবে।
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণের কথা চিন্তা করে এ দেশের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ড.একেএম আব্দুল ওয়াহেদ ১৯৬০ সালে নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ঢাকার ধানমন্ডিতে তাঁর নিজ বাসভবনে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে রাজধানী আগারগাঁওয়ে সরকারের দেওয়া প্রায় এক একর জায়গার উপর ১৯৮৮ সালে হাসপাতাল ও একটি প্রবীণ নিবাস স্থাপন করা হয়। পরে একটি জেরিয়াট্রিক ইনস্টিটিউটসহ এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। সারা দেশে প্রতিষ্ঠানটির ৯২টি শাখা রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০হাজার।
প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: বার্ধক্যে যতটা সম্ভব শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বস্তিতে থেকে প্রবীণরা যেন তাদের পরিপক্ক অভিজ্ঞতার আলোকে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে অবদান অব্যাহত রাখতে পারেন, সে লক্ষ্যে তাঁদের জন্য নানামুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

প্রবীণ বয়সে সবার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা এবং চিন্তাভাবনাহীন শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনযাপনের দিকনির্দেশনা দেওয়া।

প্রবীণদের প্রধান সামাজিক সমস্যাসমুহ:
১) আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অভাব প্রবীণদের একটি বড় অংশকে দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দেয়।
২) বার্ধক্যজনিত রোগ, যেমন-ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হদরোগ, কিডনী জটিলতা ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যার চিকিৎসা সুবিধার অভাব প্রবীণদের ভোগান্তি বাড়ায়।
৩) একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে প্রবীণরা একা হয়ে পড়ছেন, যার ফলে তাঁরা অবহেলা ও একাকিত্বের শিকার হচ্ছেন।
৪) নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণ প্রবীণদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করছে, যার ফলে তাঁরা সমাজে নিজেদের মূল্যহীন মনে করেন।
৫) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং পর্যাপ্ত বিনোদন কেন্দ্র ও আবাসন ব্যবস্থার অভাব প্রবীণদের জীবনকে কঠিন করে তোলে।
৬) আধুনিক সমাজের অংশ হিসেবে পারিবারিক কাঠামো পরিবর্তন হওয়ায় প্রবীণরা অনেক সময় নিজেদের পরিবারেই অবহেলিত হন।
৭) প্রবীণরা চুরি, নির্যাতন এবং অন্যান্য সামাজিক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন, যার কারণে তাঁদের নিরাপত্তা একটি বড় উদ্বেগ।

বড় দুখের বিষয়,যে হাতে একদিন সন্তানের মুখে আহার তুলে দিত সে হাতই প্রবীণদের চোখের পানিতে ভিজছে। তারপরেও বৃদ্ধাশ্রমে কিংবা পরিবারে ঘরের কোণায় একাকী বসে প্রিয়জনকে একপলক দেখার আশায় যেন বেঁচে আছেন তাঁরা। নিজ ঘরে বা ঘরের বাহিরে প্রবীণরা অনেকেই শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন বছরের পর বছর, আর এই মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কেউ বা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রমে একটু স্বাধীনভাবে বাঁচার আশায় । বাড়ীর পথ ভুলে কেউ বা পড়ে থাকচ্ছেন পথে ঘাটে, কেউ বা যন্ত্রণায় মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। যদিও আমি এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি না, এমনও অনেক শিক্ষিত সন্তান বড় বড় পেশায় নিয়োজিত আছেন তাঁদের পিতামাতাও একরকম মনের কষ্ট নিয়েই বৃদ্ধাশ্রমে দিনাতিপাত করছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্ত:প্রজন্ম সংযোগ তৈরীর পাশাপাশি বয়স্ক ভাতা বৃদ্ধি করা অতি প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ্যের উপরে বিভিন্ন

মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত এনজিও রয়েছে এর মধ্যে হয়তো ৫টি এনজিও পাবেন না যারা প্রবীণদের মৌলিক অধিকারগুলো নিয়ে কাজ করছে। এর কারণটা হলো প্রবীণদের নিয়ে কাজ করলে দেশী বিদেশী অর্থ সহযোগিতা নাও পেতে পারে। আর তাই সরকারের প্রয়োজন প্রবীণদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহনণ করা। জন্মের পর যে সন্তান নিজের বাবা মায়ের হাত ধরেই খুঁজে পেয়েছিল অবলম্বন আজ সেই সন্তানদের অবহেলা, নির্যাতনেই অনেক প্রবীণ শেষ অবলম্বন খঁজে নেন বৃদ্ধাশ্রমে। দেখুন বৃদ্ধশ্রমে কেউ কারোর আপন নয় তবু সবাই এখানে একে অপরের গল্পে নিজেকে খুঁজে নেয়, পায় স্বান্তনা। যে প্রবীণদের অবদানে রচিত হয় আমাদের বর্তমান, অথচ পারিবারিক অবহেলা ও নির্যাতনে একসময় তাদেরই শেষ ঠিকানা হয় বৃদ্ধাশ্রম। আর এতেই বোঝা যায় প্রবীণরা বয়সের ভারে নয় অবহেলার ভারে নুয়ে পড়ছে ।
তাই আসুন আমরা প্রবীণদের অধিকার আদায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজ সেবার সাথে একসঙ্গে কাজ করি । আজ প্রবীণ দিবসে বাবা মায়েদের বলছি, সন্তানদের নিজের সর্বস্ব দিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি একজন সঠিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন, সাথে সাথে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছি, পিতামাতার প্রতি সন্তানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসন কি বলে সে বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরার জন্য । তাহলে সেই সন্তানই হবে একদিন- বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রবীণদের প্রত্যাশা, কল্যাণ ও অধিকার আদায়ে এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে প্রবীণদের জন্য চালিকাশক্তি।

লেখক: সাংবাদিক ও সহ-সভিাপতি, প্রবীন হিতৈষী সংঘ, মেহেরপুর জেলা।

শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার

নারীর অধিকার আজকের বিশ্বে আর কেবল একটি আলোচ্য বিষয় নয় বরং এটি মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষা নারীর আত্মনির্ভরতার প্রথম শর্ত। আর সামাজিক নিরাপত্তা তার স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। একজন নারী যখন শিক্ষার

আলোয় আলোকিত হন, তখন তিনি কেবল নিজের জীবনই নয়, পরিবার ও সমাজকেও উন্নতির পথে এগিয়ে নেন। একইভাবে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাকে সহিংসতা, বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। তাই শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার রক্ষার মূল ভিত্তি এবং টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

বিশ্বে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। সকল কাজে পুরুষের প্রাধান্য নারীকে পেছনে ফেলে দেয়। কিন্তু এই পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে কখনোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে নারীকেও সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। নারীর ন্যায্য অধিকারকে সমুন্নত করতে হবে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি জাতি সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারে। নারী শিক্ষিত হলে একটি গোটা জাতির উন্নয়ন সম্ভব। আর তাই নারী শিক্ষা হলো নারীদের অন্যতম প্রধান অধিকার। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি এবং দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের মতো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের এসকল নীতি ও উদ্যোগের ফলে শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট স্বাক্ষরতার হার ৭৭.৯% এবং নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৭৫.৮% এবং ৮০.১%। তবে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর ৫০.৭%, মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর ৫৩% ছাত্রী ও উচ্চ মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থীর ৪৮.৭৫% ছাত্রী। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণও দিন দিন বাড়ছে। উচ্চশিক্ষায় মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ভর্তির হার ৪৫.৫৭%, যা বিগত বছরগুলোর চেয়ে বেশ সন্তোষজনক।

২০২৫ সালে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৩% ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাতেও নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। কারিগরি শিক্ষাতে ২০২৩ সালে মোট শিক্ষার্থীর ২৯.৫৩% নারী ছিল, যা ২০২২ সালে ছিল ২৭.১২%। যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীদের

অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে বাড়ছে, তবে নারী শিক্ষার প্রসার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে অংশ নিচ্ছেন। ১৯৯০-এর দশকে যেখানে কর্মসংস্থানে নারীর উপস্থিতি ছিল ২৪.৬৫%, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩৭% হয়েছে। এটি দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক।

এছাড়া দেশে পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০-৭৫%। শুধু শিক্ষাই নারীর একমাত্র অধিকার নয়। নারীর পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের সুযোগও রাখা হয়েছে। এছাড়া ২৯ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভ করবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের অগ্রযাত্রাকে সুষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে নারীদের জন্য বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৬৫০ টাকা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা মাসিক ৬৫০ টাকা এবং দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। এসকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সঠিক ব্যক্তি যাতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন, সে জন্য ‘ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (ডিএসআর)’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নারীদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এতে করে নারীর আর্থিক সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় আরও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বাংলাদেশে নরীরা বর্তমানে নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজারে প্রবেশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে প্রকৃত সমতা অর্জনের জন্য এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন- পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক অবস্থান, কর্মক্ষেত্রে আর্থিক বৈষম্যসহ নানারকম সমস্যা। বাংলাদেশে নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সাংবিধানিক মর্যাদার পাশাপাশি বেশ

কিছু উল্লেখযোগ্য আইন রয়েছে। এই আইনগুলো নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। এগুলো মূলত সংবিধানের সমতা ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

পারিবারিক অধিকার নিশ্চিত করতে মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনগুলোর মাধ্যমে নারীর বিবাহ, ভরণ-পোষণ, তালাক, দেনমোহর, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও অভিভাবকত্ব বিষয়ে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়। নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার, অপহরণ ইত্যাদি বন্ধ ও কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০৩, ২০২০, ২০২৫ সালে সংশোধিত)। এই আইনের ২০২৫ সালে সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ধর্ষণের মামলা তদন্তের সময় ৩০ দিন থেকে কমিয়ে ১৫ দিন এবং মামলার বিচার কাজ শেষ হওয়ার সময় ১৮০ দিন থেকে কমিয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। ফলে নারী নিপীরণের মামলার রায় প্রদান ত্বরান্বিত হবে পাশাপাশি এধরনের অপরাধও কমে আসবে। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশেষ পরিস্থিতি বাদে বাল্যবিবাহ সম্পাদন করলে শাস্তির বিধান রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২; সমান মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি (৬ মাস),কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও বৈষম্যহীন পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদানে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮), স্বামী বা পারিবারিক সদস্য কর্তৃক সহিংসতার শিকার নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে গার্হস্থ্য সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১; মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ ইত্যাদি।

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়ন দমন করতে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীদের সুরক্ষাজনিত সেবা আরও সহজীকরণ করা যেতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কলসেবা নম্বর ১০৯ সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা যেতে পারে। নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আইসিটি, ই-কমার্স ও ডিজিটাল কর্মসংস্থানে নারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি নীতি ও সামাজিক উদ্যোগে বাংলাদেশ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার, সুশীল সমাজ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যদি যৌথভাবে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আইন প্রয়োগ, অর্থনৈতিক সমতা,

সচেতনতা আর প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বৈষম্যহীন নারীবান্ধব রাষ্ট্রে পরিণত হবে। পাশাপাশি ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্তি, সুস্থ জীবন, মানসম্মত শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতাসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু কোনো লিঙ্গভিত্তিক বিষয় নয় বরং এটি একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক অগ্রগতি ও মানবিক বিকাশের সূচক। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা যেমন জ্ঞানে ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে তারা পায় বাঁচার নিশ্চয়তা ও সামাজিক মর্যাদা। তাই নারী যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সমাজে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে তার দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সকলের। নারী যখন নিরাপদ ও শিক্ষিত, তখনই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে আলোকিত ও উন্নত হয়।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

সামাজিক বিভাজন ও অপতথ্যের দায়

অপতথ্য বা ভুল তথ্য (মিসইনফরমেশন/ ডিসইনফরমেশন) শুধু ভুল ধারণা ছড়ায় না, বর্তমানে বাংলাদেশে এটি সমাজে বিভাজন ও মতপার্থক্য গড়ে তুলছে আগের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে। মানুষ, গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, ধর্ম বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভিন্ন মতবিরোধ, পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতি কমে যাওয়ার খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। অপতথ্যের উৎস হিসেবে মোটা দাগে কয়েকটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে খবর সংগ্রহের প্রবণতা। কোনটা তথ্য আর কোনটা অপতথ্য তা যাচাইয়ের দক্ষতা না থাকা ও এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি তো আছেই। একটু বিস্তারিত আলাপ করা যাক।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের এক গবেষণাপত্র ‘মিসইনফরমেশন অ্যান্ড ডিসইনফরমেশন – ডেভেলপমেন্ট লেটারস’ অনুসারে ২০২৩ সালের শুরুতে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম বেশি প্রায় ৩৮.৯ শতাংশ । কিশোর-তরুণদের মাঝে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের হার

বেশি, ১৮-২৫ বছর বয়সি যারা অনলাইনে খবর ও তথ্য দ্রুত গ্রহণ করে। একই গবেষণায় জানা গেছে, প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যবহারকারী বিভ্রান্ত হয় যে তারা সত্য-মিথ্যা তথ্য পার্থক্য করতে পারছেন না। নেচার এর অনলাইন জার্নালে প্রকাশিত ‘কগনিটিভ বিহেভিয়ার ডাটা অ্যানালাইসিস অন দ্যা ইউজ অব সোশ্যাল মিডিয়া ইন গ্লোবাল সাউথ কনটেক্সট ফোকাসিং অন বাংলাদেশ’ শীর্ষক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটায়, তাদের মাঝে ভুল তথ্য দ্রুত শেয়ার করার প্রবণতা বেশি। যে উৎস থেকে তথ্যটি পাওয়া গেছে তার ওপর নির্ভরতা ও বিশ্বাস, দ্রুত শেয়ার করার তাড়া, ব্যক্তিগত সম্পর্ক (যেমন বন্ধুবান্ধব/পরিবার) এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে না হয় অপতথ্য ছড়াল, মূলধারার গণমাধ্যমে কেনো আগের চেয়েও অপতথ্যের প্রকাশ বা প্রচার বেড়েছে? ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থা ‘রিউমার স্ক্যানার বাংলাদেশ’ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে, অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানটি মোট ৭৮টি মিথ্যা তথ্যভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের ঘটনা শনাক্ত করেছে। এর মধ্যে ৭৮টি ঘটনার প্রায় ৫২ ভাগ হচ্ছে পুরোপুরি মিথ্যা এবং প্রায় ৪৫-৫০ ভাগ মিসলিডিং বক্তব্য, ছবি বা ভিডিওকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত করে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমগুলোর ভুল তথ্য বা অপতথ্যসংবলিত প্রতিবেদন ভালোভাবে যাচাই করার ব্যাপারটি যদি উপেক্ষিত হয়, তবে অনেক পাঠকই শুধু তাদের রাজনৈতিক বা সম্প্রদায়ভিত্তিক বিশ্বাসকে অনুসরণ করে সংবাদ গ্রহণ করতে শুরু করে যা ‘ফিলটার বাবলস’ ও ‘ইকো চেম্বারস ‘সৃষ্টি করে।

অপতথ্য জনমতের দৃষ্টিভঙ্গিকে টুইস্ট করছে এবং জনউদ্বেগ তৈরি করছে। এই সামাজিক ব্যাধি ইতোমধ্যে মহামারির রূপ নিতে শুরু করেছে, তা কি আমরা বুঝতে পারছি? তরুণদের নিয়ে ইউনিসেফ এর একটি জরিপে বাংলাদেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তরুণ বলেছেন যে সামাজিক মিডিয়ায় “অত্যধিক মিথ্যা সংবাদ ও অপতথ্য” এর কারণে তারা অনেক বেশি মানসিক চাপে ভুগছেন। এই জরিপে শতকরা ৭৯ জন তরুণ বলেছেন, সামাজিক মিডিয়ায় নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা বা নিয়ম কমিয়ে দেওয়া হলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, শিশু ও নারীর মতো সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ অংশটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২০১২ সালে রামুতে একটি ফেইক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ধর্মীয় স্পর্শকাতর একটি ছবি প্রকাশের পরে একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু হয়েছিল। পরে প্রমাণ হয় ছবিটি সত্য নয়, তবে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যায়।

আমাদের সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনের ধারা কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। শিশু অপহরণের গুজবে গণপিটুনিতে নিরীহ গৃহবধূর মৃত্যু সারা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এরকম ঘটনার সময় কেন কেউ এগিয়ে আসে না, সে চিন্তা আমাদের ব্যথিত করেছে। এশিয়া ফাউন্ডেশন ও ব্রাক ইনস্টিটিউট অব গভার্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর এক জরিপে দেখা গেছে, জনগণের একটি বড়ো অংশের মানসিকতা এরকম দলে ভারি গ্রুপ, গোষ্ঠী বা দলের সাথে থাকতে হবে, নইলে টিকে থাকা মুশকিল। এর ফলে রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন দল হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্ষমতাশালী। এ ধরনের একপক্ষীয় প্রভাব থাকা সমাজ রাজনীতির জন্য নেতিবাচক বলেছেন অনেকেই। উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, ২০১৯-এ নেতিবাচক বলা মানুষের সংখ্যা ২০২২-এ এসে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমরা। অথচ এর কারণ যে অপতথ্য, তা নিয়ে ভাবছি না। সজ্ঞানে-অজ্ঞানে অপতথ্যের বিস্তার ঘটাতে কাজ করছি আমরাই। প্রচারিত অপতথ্য শুধু ভুল ধারণার উৎস নয়, এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রকটভাবে বিভাজন ইতোমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে। কারণ, মানুষ তথ্যের উৎসের ওপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে অন্যদের থেকে আলাদা মনোভাব গড়ে তোলে। তরুণরা আজ সহজেই বিক্ষুব্ধ হয়। তরুণদের মধ্যে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সেটি শুধু তথ্যের ভুলভাবে উপস্থাপন নিয়ে নয়, বরং গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি আচরণ সবসময় ন্যায়সংগত হচ্ছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং এর উত্তর তারা পাচ্ছে না। এটি বিভাজনকে বাড়িয়ে দেয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত কিংবা সাম্প্রদায়িক- যে বিভাজন বেশি হোক, এতে অপতথ্য গুজব সৃষ্টি করে অনেক সময় দ্রুত আগুনে ঘি দেওয়ার মতো কাজ করে। ঘটনাবলি সত্য বা ভুল প্রমাণিত হতে সময় লাগে। কিন্তু প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, সমাজে পারস্পরিক আস্থা কমে যাওয়া ইত্যাদির জন্য সময় লাগে না।

এটি জানতে কিছু গবেষণামূলক কাজ করা খুব জরুরি। জরিপভিত্তিক গবেষণা ও মনিটরিং বাড়ানো দরকার। সময় সময় দেশব্যাপী জরিপ করে জানা উচিত মানুষের তথ্য গ্রহণের অভ্যাস, বিশ্বাস, ভয় ও বিভ্রান্তির উৎস কি। জরিপের তথ্য পরিকল্পিত নীতি গ্রহণে সাহায্য করে। তথ্য যাচাই ও ফ্যাক্ট-চেক সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কাজকে উৎসাহ দেওয়া ও জনসচেতনতায় তাদের রিপোর্টগুলো প্রচারণা বাড়ানো যেতে পারে। জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজের মাঝে শিক্ষা ও মিডিয়া সাক্ষরতা উন্নয়নে দরকার টেকসই

পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীদের, তরুণদের শেখানো উচিত “কোনো খবর কি যাচাই করা হয়েছে?”, “উৎস কি

বিশ্বাসযোগ্য?”, “ছবি-ভিডিও পুরাতন কি নতুন?” ইত্যাদি বিষয় যত্নসহকারে দেখা। গবেষণায় পাওয়া গেছে যে যারা শিক্ষাগতভাবে উন্নত, তারা ভুল তথ্য কম শেয়ার করে। সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর উচিত ফেক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করে অকার্যকর বা বাতিল করার ব্যবস্থা নেওয়া, গুজব ছড়িয়ে পড়ার প্যাটার্ন মনিটর করা। রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় যেখানে সম্ভব, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে বিভাজন কমানোর নির্দিষ্ট দায়িত্ব আরোপ করা যেতে পারে, যাতে সহনশীলতা ও সংলাপ উৎসাহিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়, রাজনৈতিক মতের মানুষদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনার ব্যবস্থা করা উচিত, যেখানে ভুল ধারণার কারণে হওয়া বিভাজন মোকাবিলা করা যায়। মনে রাখতে হবে, দিনশেষে আমরা আমাদেরই মানুষ।

অকৃত্রিম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার প্রয়াত আব্দুর রশিদ ও আবুল কাশেম স্যার

ফেসবুকের নীল পর্দা স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ চোখ আটকে গেল। নিউজফিডে ভেসে উঠলো দুটি পরিচিত মুখ—আমাদের প্রিয়, শ্রদ্ধেয়, এখন আর না-ফেরা মানুষ—প্রয়াত আব্দুর রশিদ স্যার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম স্যার। যেন সময় এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। ছবিগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে ফিরে এল বহু বছরের জমে থাকা মধুর সময়গুলো।

এই দুই গুণী মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক শুধু পরিচয়ের গণ্ডিতে আটকে ছিল না—ছিল একসাথে হাসি, গল্প, আড্ডা আর অসংখ্য অমূল্য মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার সৌভাগ্য। আজ সেই অমলিন স্মৃতির কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরতে বসেছি।

স্মৃতির পথে পথে

গাংনী উপজেলায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের আয়োজনে “কমিউনিটি ফিলানথ্রপি” কর্মসূচি ছিল আমাদের মিলনমেলা। দুই মাস অন্তর আমরা যেতাম যশোর আরআরএফ ট্রেনিং সেন্টারে—কখনো ট্রেনে, কখনো বাসে, কখনো মাইক্রোতে। পথে ক্লান্তি বলে কিছু ছিল না।

মাইক্রোবাস ভর্তি প্রাণবন্ত মুখগুলো লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন স্যার, করমদি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, মানিকদিয়া গ্রামের বীরমুক্তিযোদ্ধা ও কবি মোজাম্মেল হক, রাজনীতিক লাইলা আরজুমান বানু আপা, মনিরুজ্জামান আতু ভাই, আর দুই প্রিয় সঙ্গী—আবদুর রশিদ স্যার ও আবুল কাশেম স্যার।

যাত্রাপথ মানেই ছিল হাসি, ঠাট্টা আর গল্পে ভরা এক উৎসব। পল্টু স্যারের রসিকতা, জাকির স্যারের মজার উপমা, কাশেম স্যারের তীক্ষ্ণ জবাব—সব মিলিয়ে সময় যেন উড়ে যেত। আর এইসব প্রাণোচ্ছ্বল মুহূর্তের মাঝেই আব্দুর রশিদ স্যার থাকতেন নীরব শ্রোতা। মাঝেমধ্যে হাসির গল্পের পুনরাবৃত্তি চাইতেন, আর বাকিদের উল্লাস দেখে মৃদু হেসে চুপচাপ থাকতেন। তার নীরবতাতেও ছিল এক ধরনের উষ্ণতা।

**আব্দুর রশিদ স্যার ছিলেন—হিসেবী, প্রতিবাদী, সৎ, অনুসন্ধিৎসু, সময়ানুবর্তী ও অত্যন্ত সৎ মানুষ। দেনাপাওনার হিসাব সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে ফেলতেন। তার পোশাক-পরিচ্ছদে ছিল নিজস্ব আভিজাত্য—পাঞ্জাবি-পাজামা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তার স্টাইলেও ছিল সেই ছাপ।

ফেসবুকে তার পোস্টগুলো কখনো কবিতার মতো কোমল, কখনো রাজনৈতিক প্রবন্ধের মতো তীক্ষè। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক কণ্ঠস্বর ছিলেন তিনি। এজন্য সমালোচনা, এমনকি হুমকিও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সত্য বলার সাহস কখনো হারাননি।

তিনি প্রযুক্তির সাথেও ছিল ভীষণ সখ্য। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সাহিত্যকর্ম লিখতেন, নতুন কোনো অপশন বা যুক্তাক্ষর লিখতে না পারলে ফোন দিতেন—“ভাই, এটা কিভাবে করবো?”
ঢাকার দেয়াল বনাম গ্রামের মুক্ত বাতাস :
ঢাকায় থাকার সময় ফোন করে বলতেন—
“ছোট ভাই, এই চার দেয়ালের মধ্যে ভালো লাগে না।”

আমি মজা করে বলতাম—
“স্যার, আপনি শহরের কোলাহল ছেড়ে চলে আসেন গ্রামীণ মুক্ত বাতাসে। যেখানে ধানের শীষ দোলে, পাখি গান গায়, খালের পানি ছুটে চলেৃ” তিনি মুচকি হেসে বলতেন—
“আমার তাপুর মেয়েটার জন্য থাকতে হচ্ছে। ওকে দেখবে কে?”আমার লেখার পাঠক :
আমি যখন কোনো গান বা কবিতা ফেসবুকে দিতাম, তিনি সবার আগে পড়তেন এবং প্রশংসা করতেন—হয়তো উৎসাহ দেওয়ার জন্যই। একদিন বলেছিলাম— “স্যার, আপনার লেখা বই আকারে বের করুন।”
তিনি রাজি হয়েছিলেন। পরে অগ্নি যুগের অগ্নি সেনা প্রকাশ করলেন । দুর্ভাগ্যবশত, সেই প্রকাশনা উৎসবে আমার থাকা হয়নি—সেই আফসোস আজও রয়ে গেছে।
শেষ কথা
আজ শুধু আব্দুর রশিদ স্যার নয়, আবুল কাশেম স্যার, সিরাজুল ইসলাম স্যার, মোজাম্মেল হক আঙ্কেল, জাকির স্যার, পল্টু স্যার—সবাই আমার জীবনে কখনো বাবার মতো, কখনো বন্ধুর মতো, কখনো অভিভাবকের মতো ভালোবাসা দিয়ে গেছেন।
যারা বেঁচে আছেন—তাদের জন্য সুস্থতা ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি। আর যারা চলে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করছি, আমিন।
(অসমাপ্ত স্মৃতিচারণ)

মুলির আয়নায় পেছনের পথ

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের সবচেয়ে সরু গলিটায় থাকে বুদু শেখ। মানুষ যাকে “মুলি” নামে ডেকে ডেকে ক্ষুদ্র করে দিয়েছে। সাড়ে তিন ফুটের শরীরটা কারো হাসির খোরাক, কেউ ভাবে প্রাকৃতিক। কিন্তু মুলির চোখে জীবন শুধু একটা লরি, যার চাকায় ঘুরে যায় রুটির হিসাব।

তার বাবা, একজন মৃতপ্রায় দিনমজুর, জীবনের শেষে বিছানায় শুয়ে কেবল একটা কথাই বলে গেছেন বারবার: “মানুষ হবি, গায়ের আকারে না, মনে। চাকা ঘুরা থামায় দিস না।”
বাবা চলে যাওয়ার দিন মুলির বয়স মাত্র বারো। সে জানত, কাঁদা

নিষেধ। কারণ, কান্না গরিবের রোজগার বন্ধ করে দেয়।
বাস টার্মিনালের ধুলোতে মুলির কৈশোর গলতে থাকে। নোংরা হেলমেট, গ্রীজ মাখা শার্ট, আর লরি চালকদের অশ্রাব্য হাসাহাসিতে সে

ধীরে ধীরে একটা শব্দের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে: “চালাবি?” প্রথমবার, এক মাতাল চালক কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিল। মুলি মাথা নিচু করে বলেছিল,
“শিখতে চাই। শুধু শেখা।”

কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু সে থেকে গিয়েছিল। চাকা ধুতো, পাম্প করতো, প্যাডেল টিপে ব্রেক কষার কায়দা শিখত পেছন থেকে। ধীরে ধীরে, হেলপার থেকে সহকারী।

একদিন এক চালক বলেন,
“তুই ছোট মানুষ না, তুই হলি চাকার নিচে চাপা পড়া মাটির ছায়া।” এই কথা তার মগজে থেকে যায়। পুরোনো এক লাল-কালো লরি। ইঞ্জিনে দম্ভ, দরজায় আঁচড়ের নকশা, নম্বর প্লেট ঝাপসাÑ তার হাতে আসে। লাইসেন্সটাও হয়, যদিও অফিসের এক ‘ভাই’-কে খুশি করতে হয়েছিল এক রাতের কাজ দিয়ে।

এপ্রিলের এক পাগল করা রাতে মুলি পাথর বোঝাই লরি নিয়ে ফিরছিল সিলেট থেকে। নির্জন রাস্তা। চারদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ। চাঁদের আলোয় পিচ রাস্তা সাপের মত চকচক করছে।

গাড়ির গতি ৮০ কিমি। হঠাৎ এক শব্দ! চিৎকার নয়, যেন পাতা চাপা পড়ার আওয়াজ।
চোখের সামনে এক বৃদ্ধা। সবকিছু ঘটে যায় এক সেকেন্ডে। বুড়ি শুয়ে ছিলেন রাস্তার পাশে। ঘুমের ঘোরে গড়িয়ে এসেছিলেন রাস্তায়। চাকা চলে যায় তার পায়ের ওপর।

মুলির বুক ধক করে ওঠে। হাত কাঁপে, পা কাঁপে, কিন্তু সে গাড়ি থামায়।
লরি আলো ফেলে রেখেছে একফালি আলোকছায়া। বৃদ্ধা কাতরাচ্ছেন। রক্তের ছিটে গরম পিচে শুকিয়ে যাচ্ছে।
চারপাশে কেউ নেই। নিঃশব্দ এক শূন্যতা। কুকুরও নেই।
মুলি হাঁটু গেড়ে বসে। বৃদ্ধার মুখে পানি দেয়। বৃদ্ধা চোখ খুলে তাকান, কিন্তু কিছু বলেন না। শুধু হালকা শব্দে “মা,” বলে যেন দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে চান।
তখনই আসে প্রশ্নটা।

“এই বৃদ্ধ বাঁচলেও কী হবে? চিকিৎসা করতে পারবে না। ঘরে অভাব। হয়তো ছেলে-মেয়েরা তাকে বোঝা ভাববে। আমি যদি এখনই শেষ করে দিই; তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারি।”
এই ভাবনা তার নিজের নয়। সেটা সে জানে। কিন্তু কখনও কখনও মানুষের মধ্যে একটা অন্ধরূপ জন্ম নেয়Ñ অতিমাত্রায় যুক্তিভিত্তিক, নির্দয় এক বিবেক।

সে লরি পিছিয়ে নেয়। এবার পুরো বুকের উপর তুলে দেয় চাকা। মুলি লরি ছালিয়ে চলে আসে মেহেরপুর। তবে ঘুম আসে না মুলির। তবু অদ্ভুতভাবে শান্তি লাগে। এক নিষ্ঠুর আত্মতৃপ্তি। যেন জীবনকে একবার বশে আনতে পেরেছে সে।
পরদিন পত্রিকায় খবর: “রাস্তার ধারে শুয়ে থাকা কোরবান নামে এক দিনমজুর বৃদ্ধ লরি চাপায় নিহত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃদ্ধটি ঘুমঘোরে অসাবধানতাবশত রাস্তায় চলে গিয়েছিলেন।”

মুলি চা খায় রাস্তার ধারের দোকানে। পত্রিকা হাতে। চোখ যায় নিজের হাতের দিকে। মনে হয় হাতটা কাঁপছে। চা-ও ভালো লাগে না আবার লাগে। জীবন যেমন চলে, পাপও চলে সাথেই।
তবে তারপর থেকে কিছু বদলে যায়।

মাঝরাতে এক অদ্ভুত ঘুম ঘিরে ধরে মুলিকে। সে দেখে তার লরির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ, একই কাপড়, একই মুখ, একফালি হাসি নিয়ে। কখনও তার দরজা খুলে যায় নিজে নিজে। কখনও ব্রেক ধরে না। সে জানে, কিছু একটা আছে, যা রয়ে গেছে।
একদিন লরির আয়নায় হঠাৎ দেখে এক জোড়া চোখ। পেছনে কেউ নেই। তবু চাকা ঘোরে না।
আজও মুলি চালায়। তবে আয়নায় সবসময় খোঁজে কিছু। এক মুখ, এক চোখ, এক ভার।

পাপ যেমন চাপা থাকে, তার একটা ওজন থাকে। সেটা গরিব হোক, চালক হোক, ছোট মানুষ হোকÑ ভুল কখনো ছোট হয় না।
মুলির চাকার নিচে শুধু রাস্তাই থাকে না, থাকে তার অতীত। আর যখনই সে নতুন হেলপারদের শেখায়, চাকা ঘোরাতে দেয়, সে কেবল একটা কথাই বলে।

“যার ওপর দিয়েই যাও, আগে দেখে নিওÑ তোমার নিজের ছায়া পড়ে আছে কিনা।”
বৃদ্ধকে পিষে ফেলার পর প্রথম তিন রাত মুলি ঘুমোতে পারেনি।

চোখ বন্ধ করলেই সে এক দৃশ্য দেখেÑ রাস্তার মাঝে একটি কুঁচকে যাওয়া শরীর পড়ে আছে। তার চারপাশে শুধু পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আর লাল রক্তের রেখা আঁকা হয়ে গেছে লরির চাকার পেছনে। আর সেই বৃদ্ধ তাকিয়ে আছেন। কোনো অভিশাপ নয়, কোনো ঘৃণা নয়, বরং এমন এক দৃষ্টি, যেন তিনি কিছু বুঝতেই পারেননি। এই “না বোঝা” টাই মুলিকে গিলে খায়।

সে ভাবে “যদি তিনি চোখে চোখ রেখে কেবল একটা গালি দিতেন, তাহলে সহজ হতো। কিন্তু কিছুই তো বললেন না… এমন কি, মৃত্যুর আগে আমাকে ক্ষমাও করে দিলেন কী? মুলি চেষ্টা করে স্বাভাবিক হতে। চা খায়, হেলপারদের সাথে আড্ডা দেয়, চালায় প্রতিদিনের মতো।কিন্তু তার মধ্যে দুইটা মুলি তৈরি হয়েছে।

একটা লরি চালায়। আরেকটা প্রতিদিন তার ডান কাঁধে বসে কানে কানে ফিসফিস করে বলে “তুই খুনী, মুলি। তোর লরি একদিন তোর দিকেই ফিরবে।”

সে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো বৃদ্ধদের দেখে না তা যেন ভয়। কখনও গাড়ি চালাতে চালাতে ব্রেক ছাড়তে ভয় পায়, মনে হয়, হঠাৎ যদি আরেকটা বৃদ্ধ চলে আসে?

সে একবার খোঁজ নিয়েছিল বৃদ্ধ’র পরিবারের। জেনেছিল বৃদ্ধ কোরবান ছিলেন নিঃসন্তান। আশেপাশের লোকজন বলেন,
“তাঁর কারো ওপর ভরসা ছিল না। একা থাকতেন, ভিক্ষা করতেন। কিছু ছিল না হারানোর মতো।”
এই কথাগুলো শুনে মুলির কিছুটা স্বস্তি লাগার কথা ছিল। কিন্তু বরং মনে হয়,

“যার কিছু নেই, তার তো আমিই সব ছিলাম। এমন এক লোকের জীবন আমি কেড়ে নিলাম, যার জন্য কেউ কাঁদেওনি।”
একদিন এক মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। ভিতরে ইমাম সাহেব বলছিলেন।

“আল্লাহ ক্ষমা করেন, যদি পাপি অনুতপ্ত হও। কিন্তু যার ওপর জুলুম হয়েছে, যদি সে না করে, তবে সেদিন হিসাব হবে।”
মুলির চোখ ফেটে পানি আসে। সে একা বসে থাকে, মসজিদের পেছনে, মাথা নিচু করে।
ভেতর থেকে একটা কান্না আসে। কিন্তু এটা চোখ দিয়ে না, আসে বুক দিয়ে, হাড়ের ভেতর দিয়ে।

তারপর থেকে মুলি বদলে যায়। সে নিয়মিত এক নির্জন জায়গায় যায়। এক পুরনো গাছের নিচে যেখানে বৃদ্ধ’র দেহ পড়ে ছিল। সেখানে একটা ছোট পাথর বসিয়েছে, কোনো নাম লেখা নেই, শুধু একটা ছোট লাল কাপড় বেঁধে রেখেছে শাখায়।
সে দাঁড়িয়ে বলে,

“আমি জানি আপনি কেউ ছিলেন না। কিন্তু আমার জন্য আপনি ছিলেন। আমি জানি আমি ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য না। কিন্তু আমি প্রতিদিন লরি চালিয়ে আপনার কাছে যাচ্ছি… একদিন আপনিই থামাবেন আমার গাড়ি।”

আজও মুলি লরি চালায়। চালায় তার গন্তব্যের জন্য না, চালায় যেন পাপকে পেছনে ফেলে পালাতে।

আয়নায় সে শুধু রাস্তা দেখে না, দেখে এক মুখ। যে মুখ কিছু বলেনি, তবু সব বলে গেছে। কারণ পাপ যেমন চাপা থাকে, তার একটা ওজন থাকে। আর সেই ওজন চাকার মতো ঘুরে ঘুরে একদিন থেমে যায় ঠিক সেখানেই, যেখানে ক্ষমা শেষ হয়।
মুলির বয়স এখন চল্লিশ ছুঁইছুঁই। গায়ের আকারটা আগের মতোই সাড়ে তিন ফুট, কিন্তু চোখের নিচে কালি, মুখে দাড়ির ছাঁট নেই, পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে লরি চালাতে চালাতে।

সে এখন আর আগের মত বেপরোয়া গতিতে লরি চালায় না। রাতে কম চলে, দুপুরে থামে বেশি। হেলপাররা ভাবে, “বুড়া হয়ে গেছে।” কিন্তু আসলে, মুলির মধ্যে এখন একটা ধীরে ধীরে পুড়তে থাকা অভিযুক্ত সময় জমে আছে।

প্রতিটা বাঁকে সে এখন দেখে। “এই জায়গাটা সেই নয় তো?” প্রতিটা বৃদ্ধ রিকশায় চড়লে সে খেয়াল করে, পা কাঁপছে কিনা। একবার তো গাড়ি থামিয়ে এক বৃদ্ধকে রাস্তা পার করিয়েছে। হেলপার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,

“কীরে ভাই, কী হলো?” সে কেবল বলে, “বৃদ্ধরা জানে না, কার গাড়ি কত পাপ নিয়ে চলে।
একদিন, হঠাৎ করেই এক ছেলেকে লরি চাপা দেয় মুলি।

নতুন হেলপার তখন স্টিয়ারিং ধরেছিল, কিন্তু মুলিই ছিল তত্ত্বাবধানে। ছেলেটি ছিল মানসিকভাবে অক্ষম। হঠাৎ করে রাস্তা পার হতে গিয়েছিল।

চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। পুলিশ আসে, গ্রামবাসী ঘিরে ধরে। এক বৃদ্ধ লোক বলে,
“এই চালক আগে এক বৃদ্ধকেও মেরেছিল, শুনছি।”

মুলির মুখ তখন পাথরের মতো। সে পালায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। এক পুলিশ অফিসার বলে, “তুমি দায়ী না সরাসরি। কিন্তু তোমাকে আটকাব তদন্তের জন্য।” মুলিকে থানায় নেওয়া হয়। থানার একটি ছোট কক্ষে সে বসে থাকে একা। চোখ বন্ধ করলে, আরেকটা কক্ষ মনে পড়ে। লরির ভেতরের কেবিন। চোখ খুললে দেখে, সামনে দেয়ালে টাঙানো একটা আয়না।

নিজের চোখের দিকে তাকায়। মনে পড়ে সেই রাত। বৃদ্ধ’র মুখ। তারপর মনে পড়ে তার বাবার কথা। “মানুষ হবি, গায়ের আকারে না, মনে। মুলি এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তিনদিন থানায় থেকে যায়। চতুর্থ দিন সকালে, ছেলেটির মা থানায় আসে। বিপরীত দিক থেকে ধীর পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ায় মুলির সামনে। চোখে পানি নেই। ঠোঁটে শুকনো দাগ।

“শুনছি তুমি খারাপ না। এক বৃদ্ধকেও নাকি একা দাফন করছিলে একসময়। ছেলেটা আমার ছিল না ঠিক করে, আমরাই তাকে পালতাম। এখন নাই। বাকি জীবন তুমিও বোঝা বইবা।” মুলি কিছু বলে না। নারীটি চলে যায়। সেই রাত, ছাড়া পেয়ে মুলি আবার লরি চালায়। কিন্তু এবার গন্তব্য নির্দিষ্ট।

সে সোজা চলে যায় সেই জায়গায়Ñ যেখানে কোরবান বৃদ্ধ’কে পিষেছিল। বছর সাতেক আগের ঘটনা। গাছটা এখনও আছে। আগের কাপড়টা নেই। সে এবার পকেট থেকে এক নতুন কাপড় বের করে। তাতে হাত দিয়ে লেখে। “আমি বুঝি। আপনি চুপ ছিলেন, আমি আর চুপ থাকতে পারি না।”

গাছের শাখায় কাপড় বেঁধে সে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে, মাটি ছুঁয়ে বলে: “আপনি যদি কোথাও থাকেন, একবার শুধু বলেন। চালাতে পারবো কিনা।” কোনো উত্তর আসে না। কিন্তু বাতাসটা হালকা হয়। গাছের পাতাগুলো হালকা নড়ে।

মুলি উঠে দাঁড়ায়। চোখের নিচে ক্লান্তির রেখা, তবু বুকটা হালকা। মুলি আজও লরি চালায়। কিন্তু লরি চালানো এখন তার কাজ না, তার ক্ষমা প্রার্থনার উপায়। প্রতিবার স্টিয়ারিং ধরার আগে সে আয়নায় দেখেÑ নিজের মুখ, নিজের দায়, নিজের পাপ।

তোজাম্মেল আযম
লেখক ও সাংবাদিক

মা বলে ডাকো

“চুপচাপ থেকে গেলে সব শব্দ হারিয়ে যায় না, কিছু শব্দ জন্ম নেয় নীরবতায়।” মুজিবনগর উপজেলার একটি ছোট শহরের সরকারি এতিমখানা। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে মা দিবসের সপ্তাহখানেক আগের দিন। ওইদিনের তপ্ত দুপুর। রোদে পুড়ছে মাঠের মাটি, গাছের পাতাও যেন ক্লান্ত। অথচ সেই খরতাপের ভেতর, একটি ছোট্ট ছেলে রাহি মুজিবনগর আম্রকাননের ছায়ায় বসে ছিল, নিঃশব্দ, নিরুত্তাপ।
তার নাম রাহি। বয়স আট, গায়ের রঙ শ্যামলা, চোখ দুটি কেমন যেন অন্যমনস্ক, যেন বহু দূরে কোনো কিছুর প্রতীক্ষা করছে।

রাহি জন্ম থেকেই এতিম। মা-বাবার মুখ কখনো দেখেনি। তার জন্য ‘মা’ শব্দটা স্কুলের বইয়ের ছড়া মাত্র।

“মা গো মা, তুমি কোথায়?” এই লাইনটি সে খুব সাবধানে লেখে, কিন্তু মনেও কি রাখে?

এতিমখানার অন্য শিশুরা মাঝে মাঝে ‘মা’ বলে কল্পনায় ডাকে- “মা যদি থাকতো, তাহলে”- কিন্তু রাহি কখনো এই খেলা খেলেনি। সে চুপ করে থাকে, যেন ‘মা’ শব্দটা তার কানে গিয়েই হারিয়ে যায়।

মা দিবস আসছে। শহরের স্কুলগুলোয় শিশুদের মায়েদের জন্য চিঠি লেখা, ছবি আঁকা, কার্ড বানানোর প্রতিযোগিতা চলছে। এতিমখানাতেও সরকারি চিঠি এসেছে- “মা দিবস উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে ছবি ও কবিতা পাঠানোর আয়োজন”।
শিক্ষিকা আপা বললেন,- “তোমরাও লিখবে, আঁকবে। মা না থাকলেও মা কেমন হলে ভালো লাগতো- এটা ভাবো।”
সবাই নিজ নিজ বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে এসেছে। কেউ লিখেছে মায়ের হাতের রান্না, কেউ ◌ি বকাবকি, কেউ মায়ের আঁচল, কেউ বা লিখেছে সৎ মায়ের যন্ত্রণার কথা…

রাহি এক কোণে বসে আছে। সে কিছুই লেখেনি। লেখার খাতাটা ফাঁকাই রেখে দেয়। লিখতে গিয়ে কলমের কালিও শুকিয়ে যায়, সে এক লাইনও লেখেনি।

পরদিন সকাল। মা দিবস।

এতিমখানার গেটে একজন মহিলা এসে দাঁড়ালেন। নাম সায়মা। পরনে হালকা সাদা শাড়ি, চোখে ক্লান্তি, হাতে একটা চিঠি। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

তিনি বললেন- “আমি… একজন শিশুকে খুঁজছি। যার নাম রাহি। সবার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কে তার? ”সায়মা ধীরে বললেন-“হয়তো কিছুই না। কিন্তু আমি চাই, আজ তাকে ‘মা দিবস’ উপলক্ষে একটি কার্ড দিই। তার যদি ইচ্ছে হয়, আমাকে একবার ‘মা’ বলে ডাকতে পারে।”
কথাটা শুনে কারো মুখে কোনো শব্দ এলো না।
রাহিকে ডাকা হলো। ছেলেটা এগিয়ে আসলো চুপচাপ। সায়মা মৃদু হেসে তার হাতে একটি কার্ড দিলেন। কার্ডে লেখা:
“যদি কখনো মা ডাকতে ইচ্ছে করে, আমি দাঁড়িয়ে থাকব গেটে। আমি জানি, তুমি হয়তো আমার না, কিন্তু আমি তো তোমার হতেই পারি।” রাহির চোখে জল এল না। সে কার্ডটা দেখে বলল না কিছু। শুধু একটু তাকিয়ে রইল মহিলার দিকে। তারপর আস্তে করে বলল এক শব্দ-
“মা”
একটি মাত্র শব্দ। এতিমখানার সেই সকাল এক মুহূর্তে যেন থমকে গেল। সায়মা ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। যেন পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় তখন রাহির জন্য সেই বুকটাই।
মা দিবস মানে শুধুই ফুল বা কার্ড নয়। মা দিবস এমন এক অনুভূতির নাম, যা জন্মসূত্রে না হলেও ভালোবাসা দিয়ে গড়া যায়। ‘মা’ এই শব্দটির কোনো সংজ্ঞা নেই। কখনো তিনি গর্ভধারিণী, কখনো আশ্রয়দাত্রী, কখনো কেবল একটি অচেনা হাত, যেটা আপন করে নেয় নিঃশর্তে।

এই গল্পটি সেইসব মায়েদের জন্য- যারা সন্তান জন্ম না দিয়েও ‘মা’ হয়ে উঠেন। আর তাদের জন্যও, যারা কখনো কাউকে ‘মা’ বলে ডাকেনি, কিন্তু একদিন ডেকেছে ভয় পেরিয়ে, বুকের গভীর থেকে।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

স্ক্রীন এডিকশন বিপন্ন প্রজন্ম

আজকাল শীশুদের দিন রাতের অধিকাংশ সময়কাটে ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাব বা অন্যান্য ইন্টারনেট কানেকটেড আধুনিক ডিভাইসের সাথে। বর্তমান সময়কে বলা হচ্ছে ডিজিটাল সামাজিক সংকটের যুগ। এই সমস্ত ডিভাইসের কারণেই সমাজে শীশুদের নিরাপত্তার বিষয়টিও ক্রমেই ঝুকিপূর্ণ আকার ধারণ করছে। একক পরিবার, চাকুরীজিবী বাবা-মায়ের সময়ের অভাব ছাড়াও স্কুল সময়ের বাইরে সন্তানদের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য অভিভাবকরা অনেকটা নিরুপায় হয়েই সন্তানের হাতে স্মার্ট ডিভাইসগুলো তুলে দেন। অনেক বাবা মা বা কাজের বুয়া ছোট সময় থেকেই বা”চাদের জিদ থেকে দুরে সরানোর জন্য পশুপাখি, কার্টুন ইত্যাদি দেখিয়ে খাওয়ানো বা ঘুমাতে অভ্য¯’ করেন। এখান থেকেই শুরুহয় আসক্তি। এর পরথেকেই শীশুদের যাপিত জীবনের দৃশ্যপট দ্রুতই বদলাতে থাকে। স্কুলের অবসরে,বাবা মার সাথে বেড়ানো বা ঘোরার সময়,যানবাহনে বসেও আজকাল চোখে পড়ে দুনিয়া ভুলে শীশুরা আপনমনে স্মার্টফোনে চোখ রেখে বসে আছে। এখন বা”চাদের প্রধান অনুসঙ্গ বা সাথী হয়ে গিয়েছে আপনজন নই,তার হাতের স্মার্টফোনটা।

একটু বড় হলে এরা গেম খেলে, টিক টক সহ অনেক অনাকাঙ্খীত সাইটে ঘোরাফেরা শুরু করে। আস্তে আস্তে তারা ডুবেযায় অবাস্তব জগতের অতল গহীনে, এখান থেকে তাদের আর বাস্তব জগতে ফেরানো সম্ভব হয় না। ভার্চুয়াল জগতের মোহে এরা হয়ে ওঠে ভিনজগত-সভ্যতার কোন অজানা মানুষ। হারিয়ে ফেলে মানুষ্য সমাজের স্বভাবিক রীতিনিতী, আচার-আচরণ বা মানবিকতাবোধ। এরা অনেকটাই মূল্যবোধহীন, দায়বদ্ধহীন যন্ত্র মানবে পরিনত হয়। একাকী থাকা, কারো সাথে না মেশা। কোন সামাজকি বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়া, মানুষকে এড়িয়ে চলা এদের নিয়মিত অভ্যাসে পরিনত হয়। শুধু তাই নয়, বয়সের সাথে সাথে এরা মাঠেগিয়ে লাইভ অনুষ্ঠান বা খেল-ধুলাা দেখে না, ঘরেবসে স্ক্রীনে দেখতে ভালবাসে। ঠিকমত ঘুম, খাওয়া দাওয়া না করা,অগোছালো থাকা এদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ঠ হয়ে উঠে। অল্পেতে এদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে, সামান্য কারণে অতিরিক্ত প্রতিক্রীয়া দেখানো বা কখনো আপন পর নাদেখে গায়ে হাত তোলার মত অপকর্ম করতেও এরা দ্বিধা করে না।

পজেটিভ চিন্তা করতে শেখে। এক ঘেয়েমি দূর করতে তাদের নিয়ে গ্রামেরবাড়ি,যাওয়া বোনভোজন,সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও বা”চারা প্রচুর উৎফুল্ল হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক হয়ে ওঠে। সম্ভব ও সমর্থ অনুযায়ী একটু দূরে কোন পর্যটন ¯’◌ান বা ভ্রমন কেন্দ্রে ঘুরেআসা যায়। আবার পাঠ অভ্যাস বাড়ালে নিজেদের মোবাইল আসক্তি অনেকটাই কমে আসে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। শিশুদের মানসিক বিকামের জন্য বাবা মাকেই র্সবাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে হতে হবে সচেতন। বাবা মাকেও পাঠ অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দেশবিদেশের গল্প-ছড়া শোনাতে হবে এবং ধীরে হলেও বই এর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। শীশুরা সব সময় রঙিন জগৎ ও প্রকৃতির সব উপকরণকেই নিজের মতকরে দেখে,কল্পনাকরে তাই চেস্টা করতে হবে ঘরের একটা কর্ণার শিশুতোষ সো-পিস, বই ও আসবাবদিয়ে যেন সাজানো থাকে সেদিকটা খেয়াল রােখেত হবে। আমরা হয়ত আমাদের সময়ের সাদাকালো যুগের মা,দাদি নানির আচঁলের তলায় শুয়ে ঠাকুমার ঝুলি বা শিব্রাম চক্রবর্তী বা”চাদের শোনাতে পারব না বা পারব না পুতুল খেলতে, বাতাবি লেবুর বল দিয়ে ঝুম বৃস্টির মধ্যে বল খেলতে অথবা নদীরপাড়ে কাদা মাটিতে ওয়াটার ডাইভ দিতে। কিš‘ সামর্থের মধ্যে বা”চাদের উপরে রাগ বা বিরক্ত না হয়ে তাদেও ই”ছাকে প্রধান্য দিয়ে কিছুটা সময়তো দিতে পারি? সন্তানদের সাথে ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক আচরণ, অভিবাদন, আপ্যায়ন সব সময় ঠিক রাখতে হবে এবং বিষয়গুলো তাদের মেনে চলায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ছোট থেকে শীশুদের যেমন ধর্মীয় কাজে যুক্ত করতে হবে তেমনি সামাজকি ও সে”ছাসেবি সংগঠনের সাথে তাদের যুক্ত হওয়ার সুযোগ করেদিতে হবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলের পরিবেশ ও আচরণ হতে হবে শীশুবান্ধব ও সামাজিক পরিবেশমন্ডিত এমনটাই সবার প্রত্যাশা। এভাবেই একদিন শীশুদের মাঝে পরপকার ও আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে আসবে।

সমজবিজ্ঞানিরা মনে করেন র্স্মাটডিভাইস বন্ধ করা সম্ভব না। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, খেলার মাঠে, পড়া ও বেড়ানোর সময় র্স্মাট ডিভাইস নিয়ন্ত্রনে সরকার,শিক্ষক,অভিভাবক ও সচেতনদের আন্তরিকতা ও সদি”ছাই আমাদের আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথে চলতে অনেকটাই সহায়ক ভ’মিকা রাখবে।

লেখক: অবঃ শিক্ষক গাংনী ডিগ্রি কলেজ।

আত্মহত্যাই জীবনের মূল সমাধান নয়

তীব্র কষ্ট, হতাশা ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মিলিত অভিজ্ঞতা এবং জেনেটিক, মনস্তাত্তিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণসহ অন্যান্য নেতিবাচক উপাদানের সম্মিলিত ফল আত্মহত্যা।

যখন কোনো ব্যক্তি তার বিবেক, বুদ্ধিমত্তা বা বিচার বিবেচনা হারিয়ে ফেলে তখন সে নিজেকে হত্যা করে। নিজেকে হত্যা করাই আত্মহত্যা। আত্মহত্যা এক অর্থে আত্ম খুন-নিজেকে নিজে খুন করা। আত্মহত্যা বলতে এমন এক ধরনের মৃত্যুকে বুঝায়, যেখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা নিজের হাতে নিজের জীবন সংহার করে। এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে না বরং বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা ব্যক্তির আত্মহত্যা করার প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।
প্রতিটি মানুষই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে আফসোস করে আমাদের জীবন কেন এত ক্ষণস্থায়ী? এত সুন্দর পৃথিবী, এত সুন্দর জীবন আর জীবনের সাথে সম্পর্কের এত মধুর বন্ধন ছেড়ে কে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে চায়? এ প্রশ্নের উত্তর, ‘না’।
প্রিয়জনকে ছেড়ে কেউই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায় না। পৃথিবীতে এমন একজনও সুস্থ মানুষ পাওয়া যাবে না যে কি না মৃত্যুর কথা মনে করলে আঁতকে ওঠে না। তবু কিসের আশায় মানুষ নিজের জীবনকে নিজেই হত্যা করছে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই সামনে চলে আসে আত্মহত্যার করুণ রূপ!

বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা মেহেরপুর। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও, আত্মহত্যার মতো এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে রুপান্তরিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের নেই কোনো সরকারি পরিসংখ্যান। কিন্তু মেহেরপুরের তিনটি থানা ও তিনটি সরকারি হাসপাতালে তথ্য ভয়াবহ।
সংবাদ মাধ্যমের তথ্যমতে ২০২৪ সালে জেলার তিনটি থানায় নথিভুক্ত হয়েছে ১১৯টি অপমৃত্যুর ঘটনা। এর মধ্যে ৫৯ জন গলায় ফাঁস দিয়ে এবং ২৯ জন বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। বাকিরা ঘুমের ওষুধ, উঁচু স্থান

থেকে লাফিয়ে পড়া বা অন্যান্য পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন।চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত অপমৃত্যুর সংখ্যা পৌঁছেছে ৪৬-এ। এর মধ্যে ২২ জন আত্মহননের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন ফাঁস, ১৭ জন বিষপান করেছেন, বাকিরা অন্যভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়েছেন।

তবে যে চিত্রটি সবচেয়ে গভীর দুশ্চিন্তা তৈরি করে, সেটি হলো আত্মহত্যার চেষ্টাকারীদের সংখ্যা। মেহেরপুরের তিনটি সরকারি হাসপাতালে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ২২৭, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪৫ এবং গান্ধীর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৮৯ জন, মোট ৩৬১ জন নারী, পুরুষ ও শিশুকে পাকস্থলী পরিষ্কারের জন্য ভর্তি করা হয়েছে। যারা কেউ ঘুমের ওষুধ, কেউ বিষ বা কীটনাশক খেয়েছেন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে।চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন অন্তত ৪০ জন। অর্থাৎ, গড়ে প্রতি ১২ ঘণ্টায় একজন মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন এই জেলায়।

জেলা তথ্য অফিস দাবি করছে, তারা গত পাঁচ মাসে ৩২টি সচেতনতামূলক সভা ও ১৬টি নারী সমাবেশ করেছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কেন্দ্রের তথ্যমতে প্রায় তিদিনই আত্মহত্যার চেষ্টাকারী রোগী আসেন। কেউ বিষ পান করে, কেউ ঘুমের ওষুধ। বাঁচলেও তারা বাকি জীবন জটিল রোগে ভোগেন। কখনো কিডনি নষ্ট হয়, কখনো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যান।

আত্মহত্যা যে কত নির্মম, আত্মহত্যা যে কত নিষ্ঠুর-তা কেবল প্রিয়জন হারা মানুষগুলো বুঝতে পারে। মৃত্যুর ওপারের জীবন কেমন আমাদের জানার সুযোগ নেই। তাই হয়তো বেঁচে থাকার এপারের জীবনে মানুষ এমন কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয় যে ঘটনায় তার জীবন হয়ে ওঠে অতি তুচ্ছ যা হননে একজন মানুষ জীবনের মহত্ত্ব একটি মুহূর্তের জন্য ভুলে যায়। এই নিষ্ঠুর ঘটনা হতে পারে একটি ঘটনা অথবা কয়েকটি ঘটনার সমন্বয় যা রূপ নেয় ভয়ংকর বিষণ্নতায় মোড়া এক অলীক পরিণতির।

আত্মহত্যা নিয়ে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক ভুল ব্যাখ্যা, ভয় এবং কুসংস্কার কাজ করে। প্রতিটি আত্মহত্যার পেছনে যিনি আত্মহত্যা করেন, তার নিজস্ব কিছু কারণ থাকে। প্রতিটি মানুষ আলাদা, আবেগ-অনুভূতিও আলাদা। আমি যেভাবে পৃথিবীকে দেখি, আরেকজন সেই দৃষ্টিতে পৃথিবী দেখবে না। তাই কেউ কেন সুইসাইড করল, এটা চট করে বলা খুব কঠিন। ডাক্তাররা কারণ বের করার চেষ্টা করেন, কিন্তু একজন মানুষের

মনের মধ্যে ঠিক কী ঘুরছে এটা বোঝা কঠিন। কেন সে এই সময়ে আত্মহত্যা করলো এটা জানাও প্রায় অসম্ভব।

অধিকাংশ মানুষ বুঝেই না বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে কেন লোকে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।তারা জানে না সিচুয়েশনাল অথবা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের কথা।তারা এটাও জানে না বাইপোলার, সিজোফ্রেনিয়া ও বর্ডারলাইন ডিজিজ কী?আত্মহনন থেকে বেঁচে ফেরা অনেক রোগী ডাক্তারকে বলেছেন যে, তারা যখন আত্মহত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা তাদের প্রিয়জনদের কথা ভাবেনি। কারণ তখন তাদের কাছে নিজেদের ব্যথাটাই খুব বেশি ছিল। মনে হতেই পারে এটা খুব স্বার্থপরের মতো আচরণ। মানুষ আত্মহত্যা করে শুধু নিজে পালিয়ে বাঁচার জন্য, অন্য কারো জন্য মরে যাওয়াটা সুইসাইড নয়।সে আসলে নিজে বাঁচার উপায় হিসেবেই মৃত্যুকে বেছে নেয়।তবে হ্যাঁ,একেকজনের কারণটা থাকে একেক রকম।

আত্মহত্যার কারণ যদি বিশ্লেষণ করি তবে, শিশুকালে যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন, সংসারের দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের স্মৃতি মানুষের ওপর ভীতিজনিত চাপ তৈরি করে, যা আত্মহত্যার কারণ হতে পারে, এমনকি অনেকদিন পরে হলেও হতে পারে। মাদক ও মদ্যপান মানুষের সুইসাইডের আশংকা বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়া, সম্পর্ক ভেঙে গেলে, চাকরি হারালে, আয়ের পথ না পেলে, সামাজিক পজিশন হারালে,লজ্জা পেলে, বুলিং ও ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হলে, আটক হলে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। ক্রমাগত অসুস্থতাও আত্মহত্যার কারণ, তবে কম।বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার, বাবা-মায়ের মধ্যে সুসম্পর্কের ঘাটতি, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, পরকীয়া, প্রেমে ব্যর্থ হওয়া, দীর্ঘদিনের দরিদ্রতা,ঋণগ্রস্ত, প্রতারণার শিকার হওয়া,শত্রুর কাছে ধরা না দেওয়া,ব্যবসায় বড় ধরনের ক্ষতি, প্রিয়জনের মৃত্যু, পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না পাওয়া, সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের অবহেলা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব, সাইবার ক্রাইমের শিকার হওয়া, ইভটিজিং, মানসিক অসুস্থতা,হতাশা ও অসহায়ত্ব বোধ থেকে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় এই পথে পা বাড়ায়।যেসব মানুষ তাদের জীবনে এ ধরনের জটিল সমন্বিত সমস্যার মুখোমুখি হন, তাদের আচরণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। আত্মহত্যার উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা ও মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে বেশির ভাগ আত্মহত্যার ঘটনাগুলো ঘটে থাকে।

যখন কারও জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক ও উপলব্ধি-অনুধাবন শক্তি লোপ পায়,

নিজেকে অসহায়-ভরসাহীন মনে হয়, তখনই ধর্ম-কর্ম ভুলে মানুষ আত্মহত্যা করে বসে। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, সে শুধু তার নিজের ওপরই জুলুম করে না বরং এতে মা-বাবা, ভাইবোনসহ আত্মীয়-পরিজন সবাই খুব কষ্ট পায় এবং অত্যন্ত বিচলিতবোধ করে।পরিবারের একজন সদস্যের মৃত্যু তার পরিবারের উপর ভয়াবহ প্রভাব রাখে। কারণ মানুষটির এই না বলে চলে যাওয়াটা, সেই মানুষটির একার বিষয় নয়। মৃত মানুষের পরিবার-পরিজন সারাজীবন একটা উত্তরবিহীন প্রশ্ন, অতৃপ্ত মন এবং গভীর শূন্যতা নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেয়।’

বিশ্বখ্যাত মনোবিশ্লেষক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানুষের অবচেতনেই থাকে ‘মৃত্যুপ্রবৃত্তি’। পরিবেশ–পরিস্থিতির প্রভাবে এই মৃত্যুপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আর তখনই হয় তার ‘মরিবার সাধ’। গবেষণায় দেখা যায়, মানবমস্তিষ্কের সেরিব্রোস্পাইনাল তরলের মধ্যে ‘৫-হাইড্রোক্সি ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড’ নামের একটি রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ কমে গেলে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রথমে বিক্ষিপ্তভাবে মনের মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা আসে। এই চিন্তাগুলো পরে বারবার আসতে থাকে। ব্যক্তি এ চিন্তা থেকে সহজে মুক্ত হতে পারে না। আত্মহত্যার চিন্তা তার স্বাভাবিক কাজকর্মের ওপর প্রভাব ফেলে। তীব্র থেকে তীব্রতর হয় তার আত্মহননের ইচ্ছা। সে ভাবে, ‘কেন আমি বেঁচে থাকব?’ সে জীবনের ইতি টানার চিন্তা করে। একসময় তার মনে হয়, তার মরে যাওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। কখনো আবেগতাড়িত হয়ে, আবার কখনো পরিকল্পনা করে সে মৃত্যুচেষ্টা করে। সফল না হলে আবার তার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে আত্মহত্যার চিন্তা আসতে থাকে। এ চিন্তার চক্র থেকে সে বের হতে পারে না। এটি তার মধ্যে ফিরে ফিরে আসতে থাকে। তাই যে ব্যক্তি কথাচ্ছলেও মৃত্যুইচ্ছা ব্যক্ত করে, ধরে নিতে হবে তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে।আবার পরিবারে যদি আত্মহত্যা বা এর চেষ্টার ইতিহাস থাকে, তবে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও আত্মহত্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়। মাদক গ্রহণ, যৌন নিপীড়নের শিকার, বয়ঃসন্ধিকালে দেহ ও মনের পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারা, আবেগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, ঝামেলাযুক্ত পরিবার আর নিজের যৌন–পরিচিতি নিয়ে সন্দিহান থাকা কিশোর আর তরুণদের মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে।

আত্মহত্যার জন্য মিডিয়াও কোন অংশে কম দামী নয়।যে ভাষায় মিডিয়ায় আত্মহত্যার খবর দেই, কিংবা যে ভাষায় আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা করে, আত্মহত্যাকে আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, সিনেমায় যেভাবে দেখানোর

চেষ্টা করে, সেটার দিকে কি আমরা কখনও ন্যূনতম মনোযোগ দিয়েছি? আমরা হয়তো খেয়ালই করি না মিডিয়ার প্রতিটা সংবাদে, কিংবা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আত্মহত্যাকে এক ধরনের যৌক্তিকতা অজান্তেই দিয়ে দেই।

আত্মহত্যার সংবাদ মিডিয়ায় যত বেশি আসে এবং সেটা যদি অসংবেদনশীল ভাষায় লিখা হয় এবং আমরা যদি সেটাকে ভুলভাবে আলোচনা করি, তাহলে সেটা আরও বহু মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। বিশেষ করে একই রকম পরিস্থিতিতে পড়া একই মানুষ একইভাবে আত্মহত্যা (কপিক্যাট সুইসাইড) করার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

একটা বদ্ধ জায়গায় চারকোল পুড়িয়ে তারপর সেখানে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিংয়ের মাধ্যমে আত্মহত্যার একটা চর্চা শুরু হয়েছিল তাইওয়ানে। এই আত্মহত্যার খবরগুলো যখন পত্রিকায় বিস্তারিত আসতে শুরু করলো তখন দেখা গেলো সে দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা তো বেড়েছেই, সঙ্গে বহু আত্মহত্যাকারী ব্যবহার করছিলেন চারকোলের ওই পদ্ধতি। পরে একই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে হংকং, চীন ও জাপানেও।

সাম্প্রতিককালে আমরা দেখবো একই রকম ঘটনার প্রবণতা আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে। কোনও কাঙ্ক্ষিত মানুষকে ফোনে অথবা ভিডিও কলে রেখে আত্মহত্যার খবর আমরা খুব বিস্তারিত (অনেক ক্ষেত্রে ছবিসহ) প্রকাশ করছি। এ ধরনের ঘটনা এখন বাড়ার প্রবণতা দেখা

সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন আত্মহত্যা একটি সামাজিক বিষয় বা ফেনোমেনা। প্রতিটি আত্মহত্যার ঘটনা সেদেশেরই সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং মানুষের মনো-সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। রাজশাহীর আত্মহত্যার তালিকায় যারা আছেন, তাদের মধ্যে সবচাইতে আলোচিত হচ্ছে পয়লা বৈশাখের দিন নন্দনগাছি স্টেশনে ষাটোর্ধ্ব রুহুল আমিনের আত্মহত্যার ঘটনা। তিনি খুব ঠান্ডা মাথায় ট্রেনের নিচে শুয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।প্রথমে ভিন্ন কারণের কথা জানা গেলেও পরে পরিবার থেকে জানানো হয়, ঋণের বোঝা বইতে না পেরে তার এমন সিদ্ধান্ত। পিঁয়াজ চাষের জন্য তিনি ঋণ নিয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন এনজিও, মহাজন ও কিছু ব্যাংক এভাবেই কায়দা করে মানুষকে ঋণ দেয়। এবং একসময় ঋণভারে জর্জরিত করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে।

সম্প্রতি আলোচিত ঘটনা মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন র্যাব কর্মকর্তা এ এস পি পলাশ সাহা। মরদেহের পাশেই পড়ে ছিল একটি

চিরকুট। সেখানে লিখে তিনি নিজের মৃত্যুর দায় নিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই বলছেন পলাশ সাহা আসলে জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। সংক্ষিপ্ত চিরকুটটিতে পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে যা লিখেছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনি মূলত পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে এই কাজ করেছেন।

এই কষ্ট বয়ে বেড়াতে বেড়াতে ব্যক্তি এতোটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে, একসময় নিজেই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটা নিজেকে একধরনের শাস্তি দেয়া। সেই সাথে মৃত ব্যক্তি হয়তো মনেকরেন দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত চরিত্রগুলো যদি একটুও শিক্ষা পায়। এই আত্মহত্যার মাধ্যমে পলাশ সাহা পরিবারের প্রতি তার ক্রোধ প্রকাশ করেছেন।

একজন মানুষ ঠিক কী কারণে জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চান, এটা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো উপসংহারে পৌঁছানো কঠিন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সাদি মহম্মদ তকিউল্লাহ ৬৬ বছর বয়সে যখন স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন, সমাজের কাছে তা এক দারুণ বিষাদময় ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আত্মহত্যা নিয়ে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন, ভুল ব্যাখ্যা, ভয় এবং কুসংস্কার কাজ করে। সাদি মহম্মদের আত্মহনন নিয়েও বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে।এই বয়সে তিনি কেন চলে গেলেন? এরজন্য দায়ী কি তাঁর একাকিত্ব, অতীতের ট্রমা, মায়ের উপর নির্ভরতা, বন্ধু-স্বজনদের পাশে না থাকা ইত্যাদি।

মেহেরপুর সদরের পুতুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পারিবারিক চাপ, সমাজের প্রত্যাশা, কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতা শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পুতুলের মানসিক চাপের একটি বড় অংশ আসে পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যাশা থেকে। বিশেষ করে বাংলাদেশে পরিবার ও সমাজ শিক্ষার্থীদের ওপর উচ্চ প্রত্যাশা আরোপ করে। তাঁদের অনেক সময় এই চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষত যদি তাঁরা একাধিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। এ ধরনের চাপ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে এবং তাঁরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

পরিশেষে, সময় বদলে গেছে। তার সাথে পাল্টে গেছে আমাদের জীবন ধারা। তাই আমাদের আরও ভাবতে হবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। ইন্টারনেট আসক্তি, সমাজের অরাজকতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, চাকরিজীবী অভিভাবকের সন্তানের জন্য সময় কম দেওয়া, প্রিয়জনের সাথে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া,

ফেসবুকের বিমূর্ত বন্ধুর মাঝে বুদ হয়ে থেকে সামনের বন্ধুকে ভুলে যাওয়া, ভিডিও গেমসের জগতে গিয়ে বিকেলে মাঠের ফুটবলের চল হারিয়ে যাওয়ার মতো কারণগুলোকে নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের।জীবনে আঘাত, দুঃখ, বেদনা, কষ্ট আসে জীবনকে শক্ত করার জন্য; মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য নয়। মনে রাখতে হবে, মৃত্যু আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়, বেঁচে থাকাটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা চাই, মানুষ নিজেকে ভালবেসে বেঁচে থাকুক, আত্মহত্যার এই দুঃখগাঁথার ইতি ঘটুক।

মেলা ও মেলার সেকাল একাল

‘মেলা’ প্রাচীন মানুষ সমাজসভ্যতার সমাবেত ভক্তি,বিনোদন ও বানিজ্য অনুসংগ। বিশ্বের এমন কোন দেশ বা জাতিগোষ্ঠি পাওয়া বিরল যেখানে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতায় মেলা অনুষ্ঠিত হয় না।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে প্রাচীনকালে টোটেম বিশ্বাসি জনগোষ্ঠি মেলাকে তাঁদের ঐশর্য্য ও ধর্মীয় চেতনার আনুসঙ্গ হিসেবে পালন করেছিল, যে ধারা এখনও আধুনিক বিশ^সমাজে চলে আসছে।

এখনও লক্ষকরলে দেখাযায়, সনাতন, অগ্নি, প্রকৃতি, সমাধি ও মাজার পূজারীদের মধ্যে জাঁকযমকপূর্ণ মেলা গুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দঃআমেরিকার মাচিপিচু,ভারতের কুম্ভমেলা ও রথযাত্রা, পারশ্য সহ মধ্যেএশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাধক পুরুষদের সমাধী বা জন্ম-মৃত দিনকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য মেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

মেলার অভিধানিক অর্থ খুঁজলে আমরা দেখতেপাই, অনুষ্ঠাটি মূলত ধর্মীয় বা সাধক পুরুষের স্মৃতিতর্পনের উদ্দেশ্যে বার্ষিক সমাবেশ বা আচার আচরণকেই বুঝান হয়। এছাড়াও বিশেষ কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে পন্যক্রয় বিক্রয় তৎসহ আমোদ প্রমোদের অস্থায়ী ব্যাবস্থাকেও মেলা বলাহয়।

যেমন বৈশাখী মেলা, বিভিন্ন পূজা বা ওরশ কেন্দ্রিক মেলা ইত্যাদি। এ ছাড়াও স্থানীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অস্থায়ী প্রদর্শনী, পন্যদ্রব্যের সাথে পরিচিত ও ক্রয় বিক্রয়ের জন্য মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

যেমন বইমেলা বুক্ষমেলা,শিল্পমেলা,বানিজ্যমেলা প্রভৃতি হাজারো রকমের মেলা। বর্তমান বিশে^র উন্নত বা উন্নয়শীল সব দেশগুলোতেই এই ধরণের মেলা অনুষ্ঠীত হয়ে থাকে। এ গুলো যেমন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ভাবে যাঁকজমকের সাথে উজ্জাপন করে তেমনি বিশেষ বৈশিষ্ঠমন্ডিত পন্য বা উৎপাদনকারি অঞ্চল বা জেলা সমুহেও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

তবে মেলার ধরণ যেমনই হোক না কেন,মাস ব্যপি উজ্জাপিত মেলাগুলোর কিছু বৈশিষ্ঠ থাকে যেমন, স্থানীয় উৎপাদন, কৃষি, হস্ত ও কুঠির শিল্প,শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সামাজকি বিনোদন, ও জাতীয় মুল্যবোধকে তুলেধরা ও নির্মল বিনোদনকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

এক সময়ে এদেশে কর্মব্যাস্ত কৃষিভিত্তিক সমাজে মানুষের বিনদনের স্থানটুকু ছিল খুবই সীমিত। শহরভিত্তিক বিনোদনের ছিটে ফোটাও গ্রমীন সমাজে প্রভাবিত হত না,ফলে গ্রামীন জনপদে ফসলতোলা শেষ হলে নির্দিষ্ট সময়ে ফসলশুন্য উম্মুক্তমাঠে আয়োজন হত কৃষকের মেলার। এসব মেলার মূল আকর্ষণ ছিল দর্শক ও উপস্থাপকদের সম্মিলিতি প্রচেষ্টর সাথে মানসিক ও শাররীক মেলবন্ধন।

অনুষ্ঠিত হত কৈৗতুক,পালাগান,আলকাপ,কবিগান,কুস্তি, মল্লযুদ্ধ,ঘাড়দৈৗড়,গরুরগাড়ির দৈৗড় প্রতিযোগিতা সহ নানাবিধ আয়োজন যা সাধারণত স্থানীয়ভাবে বা আয়োযকরাই ব্যবস্থা করতেন। তবে এসব মেলাতে মহিলা দর্শনার্থীর উপস্থিত কিছুটা কম হলেও, প্রদর্শনছিল মহিলা বিবর্জীত। এখানে দেশীয় গুড়জাত মিস্টিদ্রব্য,হস্তশিল্পজাত দ্রব্য,গৃহস্থলি ও হাল আবাদে লাগে এমন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ব্যাপক বিক্রী হত। কালের বিবর্তনে এইগুলোই এখন কৃষি ও কৃষকের মেলা হিসেবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে মিডিয়ার পর্দায় দেখা যায়।

সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে বাস্তবতার নিরিখে মেলার বৈশিষ্ঠেও আসতে থাকে ব্যাপক পরিবর্তন। এক সময়ের বড় পরিসরের মেলা গুলোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল যাত্রাপালা, সার্কাস, পুতুলনাচ, যাদু প্রদর্শনী প্রভৃতি যেগুলো মূলত দর্শনীর বিনিময়ে প্রদর্শীত হত।

এছাড়া সবই ছিল উন্মুক্ত। যেমন বিভিন্ন সমিতি, সরকারী দপ্তর, শিল্পগ্রুপ, বেসরকারী উদ্যেক্তাদের হরেক রকম স্টল। থাকত প্রদর্শনী প্লট ও মিনিয়েচার প্রদর্শনী। যেমন কৃষিবিভাগ পরিচালিত মেলাগুলো সবাইকে বেশি আকৃষ্টকরত।বিশালাকৃতির কৃষি ফসল যেমন থাকত, তেমনি মাঠ পর্যায়ে থাকত আদর্শবাড়ি,খামার মডেল প্রদর্শনী।

বন বিভাগ, প্রনীসম্পদ বিভাগ,সড়ক জনপথ,থেকে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সবাই প্রদর্শন মাঠ বা স্টলে অংশ নিত। মেলায় অল্পবয়সিদের বড়আকর্ষণ ছিল তথ্যঅধিদপ্তর পরিচালিত বড় পর্দ্য়া ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী। যা যাত্রাপালা শুরুর আগ পর্যন্ত চলতো।

দেখানো হত, সরকাররে উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামীন জনপদ,চিকিৎসা,যেগাযোগ,প্রাথমিক শিক্ষা ও গবেষণা, থাকত কাটৃুন ছবি ও দেশবরেণ্য শিল্পিদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সিনেমা। টিকিট কেটে মেলোয় প্রবেশের পরে যাদের হাতে অতিরিক্ত কোন পয়সা থাকত না তাদের জন্য ফ্রিতে এই সব প্রদর্শনী ছিল চরম বিনোদনের বিষয়। এখনকার মত এত ফাস্টফুডের আধিক্য না থাকায় মেলার মধ্যে খাবার স্টল থাকত খুবই কম।

তবে দেশি বিদেশি সংরক্ষিত বা বোতল জাত খাবারের স্টলে বা দেশীয় শুকনা খাবারের দোকানে সবধরণের খাবার পাওয়া যেত। মেলার পরিসর ও স্থায়িত্ব অনুযায়ী একটা মেলায় গৃহস্থলী প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সহ আসবাবপত্র সবই পাওয়া যেত। মেলা শুধু মাত্র গতানুগতিক বিনোদন ও প্রদর্শনের মাধ্যমই নয়, মেলার মাধ্যমেই মানুষের পরিচয় ঘটে দেশ বিদেশের আধুনিক সব জিনিষপত্রের সাথে। কাঁসা,পিতল,মটির তৈজশপত্রের পাশাপাশি মেলার হাত ধরেই সাধারণের ঘরে উঠে আসে চিনামাটি,কাঁচ,এনাডাইস মেলামাইন ও প্লাস্টিক নির্মিত আভিজাত সব পন্যসামগ্রী।

প্রতিটা মেলার মূল কাঠামোটি থাকত মেলার মাঠের ঠিক মাঝখানে। বিদ্যুতহীন পরিবেশে মাঠের বাইরে বড় ডায়নামোতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত করে মেলার প্রধার আকর্ষন আলোক ¯তম্ভের রঙিন আলোক সজ্জার ব্যবস্থা হত। পোকা যেমন আলোতে আকৃষ্ট হয়ে পিলসুজের দিকে আসে, তেমনি মানুষজন দুরদুরান্ত থেকে আলোক স্তম্ভ দেখে মেলার দিকে আসত।

অধিকাংশ স্টলেই থাকত হ্যাজাক লাইট। মেলা শুরুহত ঠিক বিকেলের দিকে একটা নির্দ্দিস্ট সময়ে। লাইন ধরে টিকেট নিতে হত, ছাত্রদের জন্য থাকত ডিসকাউন্ট। দূরদুরান্ত থেকে যারা মেলা দেখতে আসতেন তারা সারাদিনের কাজ কামাই করে গরু বা ঘোড়ার ঘাড়িতে, কেউ বা আসতেন হেটে বা সাইকেলে। অধিকাংশ মানুষ শুকনো খাবার সাথে নিতেন। তার পরেও মেলা প্রাঙ্গনের বাইরে বসত আরেক মেলা। যেখানে গরু,ঘোড়া,গাড়ি,সাইকেল পার্কিংয়ের ব্যবস্থা সহ কিছুটা আহার বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকত।

ফলে এদিকে চা নাস্তা,ভাত রুটির দোকান বসত। মেলার এই বানিজ্যিক দিকের বাইরে মেলার প্রায় চারভাগের তিনভাগ স্থান জুড়ে থাকত যাত্রা,সার্কাস,পুতুলনাচ ও যাদু প্রদর্শন। শুধুমাত্র মেলাকে কেন্দ্র করেই উপমহাদেশে বা দেশে এক সময় গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত যাত্রা,ও সার্কাসের দল। এসব দলের পরিচালক,অভিনেতা আভিনেত্রীরা পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ের নামকরা কলাকার,পরিচালক হতে পেরেছিলেন। পালাগুলো রচিত হত ঐতিহাসিক,জীবনঘণ,প্রেম-বিরহ,জবনী ভিত্তক,সংগ্রাম ও বীরগাথা কাহিনী নিয়ে। মঞ্চের ঘটনার সাথে দর্শক ও অভিনয়শীল্পিরা একাকার হয়ে যেত। সৃস্টিহত আবেগঘন পরিবেশ যেটা সিনেমা শোতে সম্ভব ছিল না। যাত্রা ও সার্কাসের শুরুতে ও বিরতিতে দেশ বন্ধনা, বীরভজন, ধ্রুপদিনাচ ও গানের অনুষ্ঠান থাকত। যেখানে অনেক সময় জাতীয়পর্যায়ের শিল্পিরাও অংশ নিতেন ।

পুতুলনাচ ও সার্কাসের বেলাতেও একই কথা বলা যায়। পুতুল নাচের কাহিনীর কোন লিখিতরূপ ছিল না। ফুটে উঠত মানুষের দৈনন্দনি জীবনের হাসিকান্না প্রেম বিরহ,বিবাদ ঝগড়া, বোকমী ও চতুরতার এক অনবদ্য চলমান আলেখ্য যা শুধু ছোট ও মেয়েদেরই না বড়দেরও সমান আনন্দ দিত। একই ভাবে যাদু প্রদর্শনী ও সর্কাস ছিল মানুষের কাছে অপার বিশ্ময়। ছেলে মেয়েদের সুউচ্চস্থানে উঠিয়ে বিভিন্ন ধরণের লাফাঝাঁপ কলা কৈশল দেখে মানুষের স্নায়ুবিক চাপ অনেকটাই বেড়েযেত। এই অবস্থা নিরসনের জন্য পশুদের খেলা, ও ভাড় প্রদর্শন বা উদ্বুদ্ধমুলক সংগীত পরিবেশন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হত। ভাড়রা বিচিত্র পোষাক ও মেকাপ নিয়ে আদ্ভুত সব ভাড়ামো করে দর্শকদের প্রচুর আনন্দদিত ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিষেশকরে ১৯৭২ সন থেকে আমাদের সংস্কৃতিক অঙ্গনের স্বকীয়তায় কিছুটা পরিবর্তন আসতে থাকে এবং ভারতীয় সাংস্কৃতির প্রভাব প্রকট হতে থাকে। মেলাগুলো জমজমাট হয় ঠিকই, কিন্তু যেহােও খোলামেলা,উদ্যোম ও নগ্ন শাররীক কলাকৌশল প্রদর্শীত হতে থাকে যা যাত্রা সার্কাসকে কলুশিত করে ফেলে।

মেলায় জুয়ার আয়োজন প্রকট হতে থাকে। ক্রমেই শিক্ষিত ভদ্র সমাজ এইসব অপবিনোদন থেকে মুখ ফেরাতে থাকে। মেলাগুলো পরিনত হয় দুবৃত্যায়নের আখড়ায়। মেলা মানেই থাকে যাত্রা, সার্কাস, ও হাউজি। যাত্রা মানেই উদ্যাম নৃত্য মেয়েদেও নগ্নশরীর প্রদর্শনী ◌্এবং চলতে থাকে প্রদর্শনের আড়ালে শাররীক সম্পর্কের অঘোষিত ব্যবসা। ঝুকিপূর্ণ খেলার পরিবর্তে সার্কসের রিং ভরেওঠে রঙবেরঙের ভাড়দের কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি ও নর্তন কুর্দনে।

এখনকার মেলাগুলোকে আমরা যতই নৈতিকতার ছত্রাবরণে ঢাকার চেস্টা করি না কেন, নস্ট সামাজিক কাঠামোতে এর পেছনের আদিমতার রশিটা ধরা থাকে উদ্ব্যেগতা,পৃষ্টপোষক ও আয়োজক নামের মাফিয়াদের হাতেই। যাদের উদ্দেশ্য হল অর্থ উপার্জন ও জাতীর ভবিষ্যত যুবসমাজের মেরুদন্ডকে সমূলে ধংশ করে দেওয়া।

লেখক: অবঃ শিক্ষক গাংনী ডিগ্রী কলেজ